রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষায় মিলের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য

শুভেন্দু সাহা*

[**সারসংক্ষেপ :** বাংলা কাব্যভাষায় সূচনালগ্ন থেকেই মিলের ব্যবহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যান্য ভাষিক উপাদানের মতো কাব্যভাষায় মিলেরও বহুমাত্রিক ব্যবহার করেছেন। কাব্যভাষায় ধ্বনিগত সংগতি বজায় রাখা এবং ভাষাকে শ্রুতিমধুর করার জন্য তিনি কবিতায় মিল ব্যবহারে কাব্যভাব ও ব্যাকরণের সমন্বয় সাধন করেছেন। কবিতার বিষয়বস্তু ও ভাবের প্রয়োজনে নতুন মিলেরও সৃষ্টি করেছেন। কবিতার মিল ব্যবহারে তিনি পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, আবার তাঁর ব্যবহৃত মিলও পরবর্তী কবিদের প্রভাবিত করেছে। কবিতার ভাষাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সকল মিল ব্যবহার করেছেন তার সবগুলোকে ব্যাকরণিক দৃষ্টিকোণে পুরোপুরি শুদ্ধ বলা চলে না। তবে মিল ব্যবহার করে তিনি কাব্যভাষায় একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছেন। পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে রচিত এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষায় মিলের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও বৈচিত্র্য আলোচিত হয়েছে।]

সংকেত শব্দ : কাব্যভাষা, ধ্বনিগত সংগতি, ভাষাশৈলী, চরণ, ছত্র, পর্ব।

১. ভূমিকা

কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষ ভাষিক বৈচিত্র্যই কাব্যভাষা। পাশ্চাত্য শৈলীতত্ত্বে কাব্যভাষাকে আদর্শ ভাষিক রূপ থেকে বিচ্যুত বলা হলেও কবিতায় একটি আদর্শ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষিক রূপ লক্ষ করা যায় (পবিত্র, ২০১১ : ১৫)। ভাষার এই বিশেষ রূপটি অন্যান্য ভাষিক কাঠামো থেকে পৃথক হয় মূলত কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দ ও মিল, শব্দশ্রেণি, বর্গ এবং বাক্যবিন্যাসে বৈচিত্র্য থাকার কারণে। প্রাথমিকভাবে কাব্যভাষা গদ্যভাষা থেকে আলাদা হয় দুটি কারণে। এক. ছন্দ এবং দুই. মিল। কাব্যে ধ্বনিগত শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে মিল। মিলের সুষম বিন্যাসে কাব্যভাষায় এক ধরনের নান্দনিক কাঠামো তৈরি হয়। তবে কবিতা হতে গেলে মিল থাকতেই হবে বিষয়টি এমন নয়। সময় বিচারে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই মিলবিহীন কবিতা দেখা যায়। কবিতায় মিলের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা গেল সে বিষয়ে দুটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। এক. মিল কবিতার রস আস্বাদন ও প্রত্যাশা পূরণের এক ব্যাকরণিক বৃত্ত তৈরি করে। মিলের এই ব্যাকরণিক বৃত্ত তৈরি করতে গিয়ে কবি পূর্বসূরিদের প্রভাব, শব্দকল্পনা ও অভিধান-চর্চার কৌশল দ্বারা তাড়িত হন। এরই ধারাবাহিকতায় ছন্দ, অর্থ ও যুক্তি দিয়ে কবিতা সৃজনের খেলা খেলেন। এই খেলা পাঠককেও স্পর্শ করে। ফলে পাঠকের নন্দনতত্ত্ব ও কবির নন্দনতত্ত্ব এক জায়গায় এসে মিলিত হয়। দুই. মিল সৃষ্টির পিছনে লোককবিতার একটি মৌখিক ঐতিহ্য রয়েছে। ছন্দ ও মিল থাকলে কোনো কঠিন বিষয়কেও সহজে মনে রাখা যায়। এই বিবেচনায় মিলের স্মৃতিসহায়ক ভূমিকাও রয়েছে। সংরক্ষণের নানাবিধ পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পূর্বে এভাবেই এক অঞ্চলের সাহিত্য অন্য অঞ্চলে প্রবেশ করেছে মানুষের মুখে মুখে। এখানে

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

মিল নান্দনিকতা ও স্মৃতিসহায়কের যৌথ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাহিত্যধারাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে (পবিত্র, ২০০৭ : ১৩৩-৩৪)।

বাংলা কাব্যধারার সূচনাকাল থেকে মিলের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। কবিরা কাব্যের ভাব ও বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে নতুন নতুন মিল সৃষ্টি করে বাংলা কাব্যভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যে সকল কবি কাব্যে মিলের যথাযথ ব্যবহার ও নতুন সৃষ্টিতে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শুরু থেকেই তাঁর কবিতায় মিলের ধারাক্রম বজায় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বিশ্লেষণ করলে উল্লিখিত দুটি বিষয়ের ধারণা আরো স্পষ্ট হয়। তাঁর কবিতায় মিলের ব্যবহার যেমন একটি ব্যাকরণিক বৃত্ত নির্মাণ করেছে, তেমনই নান্দনিকতায় পূর্ণ হয়ে রসসৃষ্টিতেও ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া স্মৃতিসহায়তার মৌখিক ঐতিহ্য বিচারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে রাখার জন্যও মিল সহায়ক উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ছন্দ নিয়ে ছান্দসিকরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মিল নিয়ে গবেষণা হয়নি। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মিলের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনার উপযোগিতা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষায় মিলের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

২. কাব্যভাষায় মিল

কবিতায় মিল বলতে ধ্বনিগত সাদৃশ্যকে বোঝায়। কবিতায় একটি চরণ, ছত্র বা পর্বের সাথে অন্য চরণ, ছত্র বা পর্বের ধ্বনিগত সাদৃশ্য হলে মিল হয়। বাংলা কবিতায় একটি চরণের সাথে তার পরবর্তী চরণ বা আরো পরের চরণে মিল যেমন লক্ষ করা যায় ঠিক তেমনি এক ছত্রের সাথে তার পরবর্তী ছত্র এবং এক পর্বের সাথে অন্য পর্বের মিলও লক্ষ করা যায়। পর্বের মধ্যে আমরা যে মিল দেখি তা একই চরণ বা ছত্রের মধ্যে হতে পারে আবার আলাদা চরণ বা ছত্রের মধ্যেও হতে পারে। বাংলা কবিতায় ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মূলত দুই প্রকারের মিল দেখা যায়: ১. সমধ্বনির মিল, ২. অসমধ্বনির মিল। সাধারণত এক ধ্বনির সাথে ঐ একই ধ্বনির মিল হলে তাকে সমধ্বনির মিল বলে। যেমন—

ফলসা বনে গাছে গাছে ⟶ আ+এ

ফল ধরে মেঘ করে আছে ⟶ আ+এ

(দুয়োরাণী)

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রে একই ধ্বনির মধ্যে মিল হয়েছে (আ+এ=আ+এ) যা সমধ্বনির মিল বলে পরিচিত। কবিতার প্রয়োজনে কবিরা এক ধ্বনির সাথে অন্য ধ্বনিরও মিল করেন। সেক্ষেত্রে কেবল শেষের ধ্বনির মিল হতে পারে, আবার নাও পারে। এ ধরনের মিলকে আংশিক মিল, পার্শ্বিক বা ধ্বনিগত নৈকট্যের মিলও বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন–

দৃষ্টিরোধ করি, যেন নিশ্চল নিষেধ ⟶ নি(ই)+ষেধ(এ)

উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ ⟶ ভেদ(এ)

(বসুন্ধরা)

এখানে প্রথম শব্দে দুটো ধ্বনিদল গঠন হলেও দ্বিতীয় ছত্রের শেষ শব্দে একটি ধ্বনি দল গঠন হয়েছে। স্বরধ্বনির মিলকরণে অসম অবস্থা তৈরি হয়েছে। আবার ব্যঞ্জনধ্বনির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়– প্রথম শব্দে /ধ/ ধ্বনির সাথে দ্বিতীয় শব্দে /দ/ এর মিল করা হয়েছে। এরা সমধ্বনি নয়। এ ধরনের মিলকে অসম ধ্বনির মিল বলে।

কবিতায় মিল এক ধরনের শ্রুতিগত মাধুর্য সৃষ্টি করে। কবিরা এই মাধুর্য সৃষ্টিতে স্বাধীনতা ভোগ করেন। তবে তাও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর কাব্যভাষায় মিলের প্রকার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা অনেক রকম মিল পাই। যেমন– মুক্তদলান্তিক মিল, রুদ্ধদলান্তিক মিল, ছত্রান্তে মিল, একান্তর মিল, দ্বি-অন্তর মিল, পর্বান্তিক মিল, আংশিক মিল। অর্থাৎ তিনি তাঁর কবিতায় মিলের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মিলের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে তিনটি প্রাসঙ্গিক পরিভাষা (ধ্বনিদল, মুক্তদল ও রুদ্ধদল) নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন ।

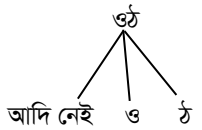
২.১ ধ্বনিদল

বাংলা কবিতায় মিলের ব্যবহার কেমন তা উপস্থাপনের জন্য ধ্বনিদল বা অক্ষর সম্পর্কে ধারণা দেয়া প্রয়োজন। আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানে, নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারিত হয় তাকে ধ্বনিদল বলে। এর পূর্বে ধ্বনিদল শব্দের স্থলে 'অক্ষর' শব্দটি ব্যবহৃত হতো যা বর্ণ বা হরফ নিদের্শ করতো। ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনায় ধ্বনিদল বা অক্ষরের প্রতিশব্দ হিসেবে সিলেবল (Syllable) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও প্রবোধচন্দ্র সেনসহ অনেক ছান্দসিক সিলেবল ও অক্ষরকে এক অর্থে ব্যবহার করতে আপত্তি জানিয়েছেন (প্রবোধচন্দ্র, ১৯৫৪ : ভূমিকা)। তাঁদের আপত্তির পিছনে প্রাচীন শাস্ত্রকরদের ব্যবহৃত 'শব্দাংশ' বিষয়টিকে সামনে এনেছেন। কিন্তু 'শব্দাংশ' ও 'সিলেবল' বিষয়টি এক নয়। যাঁরা অক্ষর শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে সিলেবল শব্দটিকে মেনে নিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে সিলেবল-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'ধ্বান্যাঘাত', 'পাদক', 'শব্দপাপড়ি' বা 'দল' শব্দের ব্যবহার করেছেন। তবে এটি মনে রাখা দরকার যে, ধ্বনিদল বিষয়টি কেবল ছন্দশাস্ত্র নয় বরং আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানেরও আলোচনার বিষয়। সিলেবল্ অর্থে অক্ষর বা ধ্বনিদল শব্দটির প্রয়োগ পুরোনো। Letter অর্থে বর্ণ এবং সিলেবল্ অর্থে ধ্বনিদল ভাষাতত্ত্বসম্মত। এই বিশেষ অর্থে সকল ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং অর্থ বিভ্রম হবার কোনো বিষয়ও পরিলক্ষিত হয়নি (তারাপদ, ১৯৭১ : ১৭-১৮)। ধ্বনিদল গঠনের ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির ভূমিকাই প্রধান (জীনাত ইমতিয়াজ, ২০০৮ : ৭৪)। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনিদল গঠনের ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির অবস্থানকে শীর্ষ (Pick) এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। পিক বা শীর্ষ পূর্বে যদি ব্যঞ্জনধ্বনি বসে তবে তাকে আদি (Onset) এবং সামনে ব্যঞ্জন বসলে তাকে অন্ত (Coda) বলে। কেন্দ্র আর অন্ত অংশ ছন্দে ও অন্যান্য ধ্বনি পরিবর্তনে গুরুত্ব পায়, সেজন্য এ দুয়ের মিলিত নাম 'মূল' বা Core বা Chime (পবিত্র, ১৯৯৪ : ১৭)। তবে অক্ষর গঠন করার জন্য আদি বা অন্ত থাকাটা আবশ্যক নয়। ধরা যাক— 'কাল' একটি ধ্বনিদল। এর শীর্ষবিন্দু নির্ণয় হবে নিম্নোক্তভাবে—



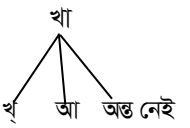
এখানে 'আ' শীর্ষে অবস্থান করে ধ্বনিদল গঠন করে। 'ক' এখানে আদি বা অনসেটের এবং 'ল' অন্ত এর ভূমিকা পালন করেছে। তবে সবসময় ধ্বনিদল গঠনের ক্ষেত্রে আদি বা অন্ত না থাকতেও পারে। যেমন–





এখানে 'ও' শীর্ষে অবস্থান করে ধ্বনিদল গঠন করে। 'ঠ্' এখানে অন্তের ভূমিকা পালন করেছে। তবে এখানে আদি অনুপস্থিত থাকলেও ধ্বনিদল গঠনে কোনো সমস্যা হয়নি।





এখানে 'আ' শীর্ষে অবস্থান করে ধ্বনিদল গঠন করে। 'খ্' এখানে আদির ভূমিকা পালন করেছে। তবে এখানে অন্ত অনুপস্থিত থাকলেও ধ্বনিদল গঠনে কোনো সমস্যা হয়নি।

বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানে যেমন ধ্বনিদল গঠনে স্বরধ্বনির ভূমিকা রয়েছে ঠিক তেমনি কাব্যভাষায় মিলের বন্ধন বজায় রাখার জন্য স্বরধ্বনির মাধ্যমে সৃষ্ট ধ্বনিদলের ভূমিকা রয়েছে। কাব্যভাষায় মিলের ব্যবহার ও ছন্দ আলোচনার জন্য অক্ষরকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা– মুক্তদল (Open Syllable) এবং রুদ্ধদল (Closed Syllable)।

২.২ মুক্তদল

মুক্তদল বলতে আমরা ঐ সকল ধ্বনিকে বুঝি যা উচ্চারণকালে ফুসফুস তাড়িত বাতাস কোথাও আটকে যায় না এবং প্রয়োজন মতো টেনে উচ্চারণ করা যায়। যেমন : অ, আ, ক, খ, পা, হি, হা, কে, কু ইত্যাদি। মুক্তদল আবার অযুগ্মধ্বনি, বিবৃত অক্ষর, মুক্তস্বর এবং মুক্তাক্ষর নামেও পরিচিত (আবদুল লতিফ, ২০০১ : ২৮)।

২.৩ রুদ্ধদল

রুদ্ধদল বলতে ঐ সকল ধ্বনিকে বুঝি যা উচ্চারণকালে ফুসফুস তাড়িত বাতাস কোথাও আটকে যায় বা ইচ্ছেমতো টেনে উচ্চারণ করা যায় না। রুদ্ধদল দুই প্রকার। স্বরান্তিক এবং ব্যঞ্জনান্তিক। যেমন : ঐ, ঔ, আও, ভুই ইত্যাদি স্বরান্তিক এবং বাট্, ছাট্, কট্, গুল্, ভুল্ ইত্যাদি ব্যঞ্জনান্তিক। রুদ্ধদলকে যুগ্মধ্বনি বা সংবৃত অক্ষর বা রুদ্ধস্বর বা বদ্ধাক্ষরও বলা হয় (আবদুল লতিফ, ২০০১ : ২৮)। বাংলা কাব্যভাষায় মিলের যে সাংগঠনিক ব্যবহার দেখা যায় তা প্রধানত মুক্তদলান্তিক এবং রুদ্ধদলান্তিক মিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মিলের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় মিলের বহুমাত্রিক ব্যবহার দেখিয়েছেন। কখনো কখনো সৃষ্টি করেছেন নতুন মিল। যদিও ত্রিশের দশকে রচিত *পুনশ্চ* (১৯৩২), *শেষ সপ্তক* (১৯৩৫), *পত্রপুট* (১৯৩৬), *শ্যামলী* (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থে তিনি মিল বিষয়টি পরিহার করেছেন। উপরে উল্লিখিত সকল মিলের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় দেখা যায়। নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় উল্লিখিত মিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৩.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুক্তদলান্তিক মিল

কবিতায় মুক্তদলের সাথে মুক্তদলের যে মিল পাওয়া যায় তাকে মুক্তদলান্তিক মিল বলে। মুক্তদলান্তিক মিল মূলত তিন প্রকার : ১. একদল বিশিষ্ট, ২. দুইদল বিশিষ্ট এবং ৩. তিনদল বিশিষ্ট। তিনের অধিক দলের মিলকে বহুদলান্তিক মিল বললেও বাংলায় চার বা পাঁচের অধিক দলের মিল নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুক্তদলান্তিক মিলের সব উদাহরণই দেখা যায়।

৩.১.১ একদল বিশিষ্ট মিল : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুতোষ কবিতা বা ছড়ায় এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। বিশেষ করে *শিশু* ও *শিশু ভোলানাথ* কাব্যগ্রন্থে এই মিলের ব্যবহার অনেক বেশি করা হয়েছে। স্মৃতিসহায়ক হিসেবে এই মিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন—

সারাদিন ঝরঝর থথর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন **ভাবে ও,** আ+এ > ও – ১টি স্বরধ্বনি
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও। আ+এ > ও – ১টি স্বরধ্বনি
(তালগাছ)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে— মিল হচ্ছে শুধু স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির যা ধ্বনিদল গঠনে পিক বা শীর্ষে অবস্থান করছে। ব্যঞ্জন এখানে আদি বা অনসেটের ভূমিকা পালন করলেও মিলের বেলায় তা বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ একদলান্তিক মুক্ত মিলে স্বরধ্বনিই মূল ভূমিকা পালন করেছে।

৩.১.২ দুইদল বিশিষ্ট মিল : বাংলা কবিতায় দুইদল বিশিষ্ট মিলের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। অনেক কবির মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাতেও এর উদাহরণ রয়েছে প্রচুর। যেমন—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে **তরী** ⟶ (তো+রি= ব্যস্বব্যস্ব)
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে **ভরি**। ⟶ (ভো+রি= ব্যস্বব্যস্ব)
(সোনার তরী)

উল্লেখ্য, উপরের দৃষ্টান্তে স্ব = স্বর এবং ব্য = ব্যঞ্জন। পরবর্তী দৃষ্টান্তসমূহেও এই শব্দসংক্ষেপ ব্যবহৃত হয়েছে।

এ সকল উদাহরণে যে দুটি দলের মধ্যে মিল সাধিত হয়েছে তার গঠন বিন্যাস 'ব্যঞ্জন+স্বর' আবার 'ব্যঞ্জন+ স্বর'। কিন্তু সর্বদা এমন মিলই যে হবে বিষয়টি এমন নয়। বরং এই বিন্যাস 'স্বর+ব্যঞ্জন' আবার 'ব্যঞ্জন+স্বর' বা 'স্বর+স্বর' আবার 'স্বর+স্বর' বা 'ব্যঞ্জন+স্বর' বা 'স্বর+ব্যঞ্জন+স্বর' হতে পারে। এটি নির্ভর করে কবির ভাষাশৈলীর উপর। যেমন—

ছোটো কথা, ছোটো গীত, আজি মনে **আসে** ⟶ (আ+সে=স্বব্যস্ব)
চোখে পড়ে যাহা কিছু হেরি চারি **পাশে** ⟶ (পা+শে= ব্যস্বব্যস্ব)
(ধরাতল)

এখানে লক্ষ করার মতো বিষয় এই যে, দ্বিতীয় চরণের শেষে /বস্বব্যস্ব/ বজায় থাকলেও প্রথম চরণের শেষে প্রথম স্বরধ্বনিটি নিজেই একটি ধ্বনিদল গঠন করে ফেলায় এর গঠন হয়েছে /স্বব্যস্ব/। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার— "মিলের নূণ্যতম শর্ত হল, দুটি স্বরের পরম্পরায় এবং

উচ্চারণের দিক থেকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনে মিল বা নৈকট্য থাকবে" (পবিত্র, ২০০৭ : ১৩৬)। রবীন্দ্রনাথ মিলের এমন ধারা বজায় রেখে অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

৩.১.৩ তিনদল বিশিষ্ট মিল : তিনদল বিশিষ্ট মিলের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কোনো সাংগঠনিক কাঠামো নেই। অর্থাৎ কখনো তা /স্বব্যস্বব্যস্ব/ বা /ব্যস্বব্যস্বব্যস্ব/ বা /স্বব্যস্বব্যস্ব/ হতে পারে। এখানে মিলের ভিত্তি স্বর পরম্পরা এবং মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের নৈকট্যের ঘনত্ব। ঠিক এভাবে আকাল-মাকাল, সাতাশি-বাতাসি, নিবে কে-দিবে কে, খাবো না-যাবো না, যন্ত্রনা-অল্প না ইত্যাদি মিলকরণ করা সম্ভব। তবে তা অবশ্যই কবিতার ভাবের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও এই আলোচনার বাইরে নয়। তাঁর কবিতায়ও তিন দল বিশিষ্ট মিলের অনেক উদাহরণ রয়েছে, তবে সবসময় সেসকল মিল ব্যাকরণিক শুদ্ধতার নিরিখে পরিমাপ করা কঠিন। যেমন—

যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব **উহারে** ⟶ (উ+হা+রে=স্বব্যস্বব্যস্ব)
মরণ যেদিন আসবে আমার **দুয়ারে**। ⟶ (দু+আ+রে=ব্যস্বস্বব্যস্ব)
(গীতাঞ্জলি)

বাংলা কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিন দল প্রয়োগ করে যে মিল বিন্যাস করা হয়েছে তাকে শুদ্ধ মিলচর্চার ছাঁচে ফেলা যায় না। আধুনিক কবিতাতেও এমন গোঁজামিলের উদাহরণ পাওয়া যায়।

৩.১.৪ বহুদল বিশিষ্ট মিল : তিনের অধিক মুক্তদল বিশিষ্ট মিলকে বহুদল বিশিষ্ট মিল বলে। বাংলা কবিতায় এর যথার্থ উদাহরণ নেই বললেই চলে। চর্যাপদে এরকম বহুদলের মিল যা উপরের ছত্রান্তে চার দলের এবং নিচের ছত্রান্তে তিন দল দিয়ে মিলকরণ করা হয়েছে। ৪, ১৮, ১৯, ৩৪ নং চর্যায়ও এমন মিল পাওয়া যায় (এবাদত, ১৯৯১ : ১১১)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও* এর উদাহরণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে অনেক মিল পাওয়া যায় যা চার বা অধিক দল বিশিষ্ট। যেমন– পরবেশীঅ > আবেশি (এখানে চারদল এবং তিনদলের মিল হয়েছে)। তবে এসকল মিলও ব্যাকরণিকভাবে শুদ্ধতার উর্দ্ধে নয়। আধুনিক যুগের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কিছু মিলের বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। যেমন—

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে (কা+দি+তে=তিনটি দল)
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে? (স+মা+ধি+তে=চারটি দল)
(মুক্তি)

এখানে প্রথম ছত্রে তিনটি ধ্বনিদল গঠিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ছত্রে চারটি ধ্বনিদল গঠন হয়ে মিল করা হয়েছে। যা বহুদল বিশিষ্ট মিলের উদাহরণ। তবে এটিও ব্যাকরণিক দৃষ্টিতে যথার্থ মিলবিন্যাস নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "বসুন্ধরা" কবিতায় এমন মিল দেখিয়েছেন। যেমন–

দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া **৪টি দল**
বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া **৪টি দল**

এই কবিতায় তিনি বেশ কয়েকটি চরণে এমন মিলকরণ করার চেষ্টা করেছেন।

৩.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় রুদ্ধদলান্তিক মিল

রুদ্ধদলান্তিক মিলে শেষ দলটি মূলত রুদ্ধদল থাকে। এই শেষ রুদ্ধদলটিকে বদ্ধদল বা বদ্ধাক্ষর বলেও অভিহিত করা হয় (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪ : ১৫)। রুদ্ধদলান্তিক মিলের উদাহরণ বাংলা কাব্যভাষায় চর্যাপদ থেকেই পাওয়া যায়। তবে রুদ্ধদলান্তিক মিলের বৈচিত্র্য অনেক বেশি, তাই একে নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক ছাঁচে ফেলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন—

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
কত প্রেম হায় কত বাসনায়
কত সুখে দুখে কাজে হে।

(গীতাঞ্জলি)

কবিতাটির তিন চরণের শেষে 'বেদনায়-ঘনায়-বাসনায়' এর মিল হয়েছে রুদ্ধদলান্তিক রীতি মেনেই। প্রথম চরণে শেষের শব্দে তিনটি দল থাকলেও পরের লাইনে দলের সংখ্যা দুটি, আবার তৃতীয় চরণে দলের সংখ্যা তিনটি। এখানে যে তিনটি শব্দ চরণদ্বয়ের মধ্যে মিল সাধন করেছে তাদের শেষে স্বরধ্বনি থাকলেও তা অর্ধস্বরের মতো কাজ করেছে। অর্থাৎ মিল হয়েছে নায়-নায়-নায় (আয়)। সেক্ষেত্রে এখানে রুদ্ধদলান্তিক যে মিল সাধিত হয়েছে তাকে আমরা একদল বিশিষ্ট মিল বলতে পারি। তবে সর্বদা যে এমনটা ঘটবে বা ঘটেছে তা নয়। বরং এমনও হতে পারে যে– মিল সাধিত হয়েছে একদলে তবে সেই একদলটি অন্য কোন বৃহত্তর শব্দের অংশ। অর্থাৎ কবি এখানে স্বাধীন। তবে এই মিলের ক্ষেত্রে শেষের স্বর বা অর্ধস্বর দুটি এক হতে হবে। আবার কখনো কখনো শেষের স্বর বা পরবর্তী ব্যঞ্জন বা অর্ধস্বর যদি এক হয় তবে মিল হতে পারে।

চঞ্চল আলো আশার **মতন** ⟶ **অন**
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু **তখন** ⟶ **অন**
আছে কি হোথায় নবীন **জীবন** ⟶ **অন**
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে?

(নিরুদ্দেশ যাত্রা)

এই কবিতার মিলবিন্যাসে আমরা যে দলগুলোকে পাই তা হলো, তন-খন-বন। এখানে মিলের মূল হিসেবে কাজ করেছে 'অন' অংশটি। এই মিলকে একদলান্তিক রুদ্ধমিল বলতে পারি।

দুইদলান্তিক রুদ্ধমিলের ক্ষেত্রে কবিরা যথেষ্ট স্বাধীন থাকেন। চাইলে তারা 'রুদ্ধদল+রুদ্ধদল'= 'রুদ্ধদল+রুদ্ধদল' মিল দিতে পারেন। ছড়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের মিলকরণ তুলনামূলক সহজ। ব্যতিক্রমও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়ও এর উদাহরণ রয়েছে। 'মুক্তদল+রুদ্ধদল'='মুক্তদল+রুদ্ধদলের' মিলও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। যেমন—

সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে, কবিরে তোমার — তো(মুক্ত)+মার(রুদ্ধ)
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন আবার — আ(মুক্ত)+বার(রুদ্ধ)

(মানসসুন্দরী)

তিন দল বিশিষ্ট মুক্তদলের মিল যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তিনদলান্তিক বদ্ধমিল বা ব্যঞ্জনের মিল খুব একটা পাওয়া যায় না। তবে 'ভবঘোর-নবজোড়' কিংবা 'বিচারণ-শ্রীচারণ' এভাবে মিলকরণ করা যেতে পারে। তবে সেটা কৃত্রিমতা বর্জিত হবে না। এ ধরনের যান্ত্রিক মিল যে

কবিতায় ব্যবহার করা হয়, সে কবিতার মধ্যে এক ধরনের উচ্ছলতার সুর থাকে (পবিত্র, ২০০৭ : ১৩৮)। কবিরা যেমন কবিতায় অলঙ্কার বা উপমা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ঠিক তেমনি মুক্তদল বা রুদ্ধদল ব্যবহারে স্বাধীনতা ভোগ করেন। ফলে নিজস্ব শব্দভাণ্ডার ও ভাষাবোধের নৈকট্য তাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য হয়। সেভাবেই মিলের ঝঙ্কার তৈরি হয় কবিতায় এবং সেখানে ব্যাকরণিক বিরুদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়ও রয়েছে।

১. ছত্রান্তে মিল

ছত্রান্তে মিল কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণভাবে একটি ছত্রের শেষের ধ্বনির সাথে পরবর্তী ছত্রের শেষের ধ্বনিটির মিলকে ছত্রান্তে মিল বলা যেতে পারে। বিষয়টি আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে ছত্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। এক সারিতে সাজানো শব্দ সমষ্টিকে ছত্র বা পঙক্তি (Line) বলা হয় (আবদুল লতিফ, ২০০১ : ৩৩)। অনেকে ছত্র এবং চরণের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, চরণ বলতে কবিতায় ব্যবহৃত একটি পূর্ণ বাক্যকে বোঝায়। অর্থাৎ একটি ছত্রে যেমন এক বা একাধিক চরণ থাকতে পারে আবার একাধিক ছত্র মিলেও একটি চরণ হতে পারে। অনেক ছান্দসিক ছত্রান্তে মিল বা পঙ্‌ক্তিশেষ মিলকে অন্ত্যমিল হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু আদতে অন্ত্যমিল ধারণাটি পর্ব বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত। আমরা যদি ছত্রান্তে মিল বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে যাই তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় শিশুতোষ কবিতায় বা ছড়ায় এর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় এ ধরনের মিল দেখা যায়। এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো যে, শুধু পর পর দুটি ছত্রের শেষ ধ্বনির মিলনই যে ছত্রান্তে মিল হবে বিষয়টি এমন নয়। পর পর দুটি ছত্রের শেষ ধ্বনির যে মিল সেই ঐতিহ্য চর্যাপদের সময় থেকেই পাওয়া যায়। এ ধরনের মিলকে আমরা দ্বিপদী মিল হিসেবেও আখ্যা দিতে পারি। এমন মিলের ক্ষেত্রে সাধারণত ক-ক, খ-খ, গ-গ মিল হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসংখ্য কবিতায় এই ধারা অনুসরণ করেছেন। যেমন—

মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে	ক
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে	ক
বলে, 'আমায় কেবল করি খেলা,	খ
সকাল থেকে দুপুর সন্ধেবেলা।	খ
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,	গ
রুপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে,	গ

(মাতৃবৎসল)

এক্ষেত্রে প্রথম ছত্রের শেষ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় ছত্রের শেষ ধ্বনি আবার তৃতীয় ছত্রের শেষ ধ্বনি ও চতুর্থ ছত্রের শেষ ধ্বনির মিল হয় এবং এটা ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। তবে পর পর দুই লাইনে যে মিল ব্যবহার করা হয় পরবর্তী দুই লাইনে একই মিল ব্যবহার করা হবে না আবার তার পরের দুই লাইনেও পূর্বের মিলের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

২. একান্তর মিল

এ ধরনের মিলের ক্ষেত্রে বিজোড় ছত্রের সাথে বিজোড় ছত্রের ও জোড় ছত্রের সাথে জোড় ছত্রের শেষ ধ্বনির মিল হয়। এক ছত্র অন্তর অন্তর এই মিল হয় বলে একে একান্তর মিল বলে। অর্থাৎ– /প্রথম ছত্র+তৃতীয় ছত্র/ আবার /দ্বিতীয় ছত্র+চতুর্থ ছত্র/। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতায় এ ধরনের মিল দেখা যায়। যেমন–

রাজধানী কলিকাতা; তেতালার ছাতে ১ বিজোড়
কাঠের কুঠরি এক ধারে; ২ জোড়
আলো আসে পূর্ব দিকে প্রথম প্রভাতে, ৩ বিজোড়
বায়ু আসে দক্ষিণের দ্বারে। ৪ জোড় (বর্ষাযাপন)

৩. দ্বি-অন্তর মিল

মূলত দুই ছত্র অন্তর মিলবিন্যাসকে দ্বি-অন্তর মিল নাম দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ প্রথম ছত্রের সাথে চতুর্থ ছত্রের মিল হয় এক্ষেত্রে। মাঝে দুই এবং তিন ছত্র বাদ যায়। অনেকক্ষেত্রে মাঝের দুই ছত্রে মিল হয়, আবার হয়ও না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু কবিতায় এমন মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অসংখ্য সনেটে এই মিল বেশি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি **বন্ধন**
স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি **মন**
(বন্ধন)

এখানে প্রথম ছত্র এবং চতুর্থ ছত্রের শেষ ধ্বনিতে মিল হয়েছে, মাঝে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (মোট ২টি) ছত্রকে বাদ রেখে। লক্ষণীয় বিষয় যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রের শেষ ধ্বনিরও মিল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বহুগানে ও সনেটে এই মিলকে অনুসরণ করেছেন।

বাংলা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ছত্রান্তে মিল নিয়ে কবিরা নানামুখী চেষ্টায় রত হয়েছেন। ফলে ছত্রান্তে মিলের বহুবিন্যাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ছত্র ও চতুর্থ ছত্রের মিল কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে কোন মিল হয়নি এমন উদাহরণও রয়েছে অনেক। আবার এমন মিলও দেখা যায় যেখানে পর পর বেশ কয়েকটি ছত্রে মিল সাধন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম ছত্র=দ্বিতীয় ছত্র=তৃতীয় ছত্র=চতুর্থ ছত্র। আবার জীবনানন্দ দাশের কিছু কবিতায় প্রথম দুই ছত্র বাদ দিয়ে পরবর্তী তিন ছত্রে মিল করা হয়েছে। 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটির কথা হয়' কবিতায় কবি এই অদ্ভুত ছত্রান্তে মিলবিন্যাস দেখিয়েছেন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবিরা যে সর্বদা ছত্রান্তে মিলের বিকাশ ঘটাবেনই, বিষয়টি এমন নয়। কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত মিলের উপরে শব্দের গাঁথুনি দিয়ে কবি আপন কল্পনায় কবিতা লেখেন। বর্তমান সময়ে কবিতার গদ্যছন্দের যুগে কবিরা মিলের প্রত্যাশাকে অনেকটা পাশ কাটিয়ে চলেন। প্রত্যাশিত দুটো মিত্র শব্দকেও অনেক সময় অনেক দূরে নিয়ে যান কবিতারই প্রয়োজনে। বর্তমান কালের কবিতায় ছত্রান্তে মিল খুব বেশি প্রাসঙ্গিক না হলেও পূর্বেকার মতো গানের ক্ষেত্রে ছত্রান্তে মিলের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে।

৪. পর্বান্তিক মিল

পর্বান্তিক মিল অর্থাৎ পর্বের অন্তে মিল। এখানে পর্ব বলতে এক নিঃশ্বাসে বা একঝোঁকে পঙ্‌ক্তি বা চরণের যতোখানি উচ্চারণ করা যায় তাকে বুঝায়। পর্ব নির্ধারিত হয় যতির দ্বারা। পঙ্‌ক্তির শুরু থেকে যতি পর্যন্ত বা প্রথম যতি থেকে পরবর্তী যতি পর্যন্ত কাব্যাংশকে পর্ব বলে। পদ অর্থেও অনেক ছান্দসিক পর্ব বিষয়টি উপস্থাপন করে থাকেন। পর্বান্তিক মিলের ক্ষেত্রে একই চরণ বা পঙ্‌ক্তির মধ্যে অবস্থিত একটি পদ বা পর্বের সাথে অন্য একটি পদ বা পর্বের মিলকে নির্দেশ করে। আবার ভিন্ন ভিন্ন পঙক্তির পদের বা পর্বের মধ্যেও মিল সাধিত হয়। এক্ষেত্রে কিছু থাকে পূর্ণ পর্বে মিল আবার কিছু থাকে অপূর্ণ পর্বে মিল। যেমন–

শুধু বিঘে-**দুই**। ছিলো মোর **ভুঁই**,। আর সবই গেছে। **ঋণে**।
বাবু বলি**লেন**–। 'বুঝেছো উপেন?। এ জমি লইবো। **কিনে**।'
(দুই বিঘে জমি)

রবীন্দ্রনাথ রচিত এই দুটি পঙ্‌ক্তির দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়– প্রথম পঙ্‌ক্তিতে মোট চারটি পর্ব রয়েছে যার প্রথম দুটোর মধ্যে মিল বন্ধন হয়েছে 'দুই' এবং 'ভুঁই' শব্দযুগলের মাধ্যমে আবার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রেও চারটি পর্ব থাকলেও প্রথমটিরই মতো শুধু প্রথম দুই পর্বে 'লেন' এবং 'পেন' শব্দাংশের মাধ্যমে মিল বন্ধন হয়েছে। এই মিলকে আমরা একই চরণে পর্বান্তিক মিল বলে ব্যাখ্যা দিতে পারি। আবার প্রথম পঙ্‌ক্তির চতুর্থ পর্বের সাথে দ্বিতীয় পঙক্তির চতুর্থ পর্বের মিল বন্ধন হয়েছে 'ঋণে' ও 'কিনে' শব্দযুগলের মাধ্যমে। এ ধরনের অন্ত্যমিলকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তির মধ্যে অন্ত্যমিল হিসেবে আখ্যা দিতে পারি। আলোচ্যমান পঙ্‌ক্তিযুগলে একই চরণে যে মিল পাওয়া যায় তা পূর্ণ পর্বের মিল হলেও ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে যে মিল হয়েছে তা অপূর্ণ পর্বের মিল হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ অন্ত্যমিলের বিষয়টি নেই তবে মধ্যযুগের পর্বান্তিক মিলের উদাহরণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার থেকে গানে অধিক পর্বান্তিক মিল ব্যবহার করেছেন এবং এর আলঙ্কারিকতায় প্রাচুর্য বিদ্যমান (পবিত্র, ২০০৭ : ১৩৭-৩৯)। বর্তমানে পর্বে পর্বে বিভাজিত করে এই মিলের ব্যবহারে কবিরা খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। উপরি উল্লিখিত নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থেকেই কবিরা সর্বদা পর্বান্তিক মিলের ব্যবহার দেখান বিষয়টি এমন নয়। বরং অন্যান্য মিলের মতো কবিরা পর্বান্তিক মিলের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য-বিন্যাস করেছেন। যেমন—

চুল তার। কবেকার। অন্ধকার। বিদিশার। নিশা (জীবনানন্দ, ২০১০ : ১১)

এখানে একই পঙ্‌ক্তিতে চারটি পর্বে একই মিল দেখা যায়। আবার এর পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে এমন কোনো বিষয় পরিলক্ষিত হয় না। একে অনেক ছান্দসিক মধ্যানুপ্রাস বা মধ্যমিল বলে অভিহিত করেছেন। অনেক সময় কবিতায় ব্যবহৃত মিল ও এর বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য এক ধরনের শ্রুতি মাধুর্য তৈরি করে।

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব-
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও **ভস্ম** ;
মিলিবে কি তাহে হস্তী **অশ্ব**,
না মিলে **শস্য**কণা। (পুরস্কার)

এই পঙ্‌ক্তিগুলোতে পর্বান্তিক মিল হয়নি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে শেষে যে মিল বিন্যাস দেখতে পাই তা একরকম অন্তমিল আবার অনুপ্রাসও বটে। যা একই সাথে দৃষ্টি ও শ্রুতিগ্রাহ্য হয়।

৫. আংশিক মিল

এমন অনেক কবিতা দেখা যায় যেখানে কেবল শেষের স্বরধ্বনির মিল হয়েছে কিন্তু এর পূর্বের স্বর বা ব্যঞ্জনের মধ্যাকার কোন মিল হয়নি সেক্ষেত্রে একে পূর্ণাঙ্গ মিল হিসেবে বিবেচনা করা কঠিন। এখানে মিলের ধারণা আংশিক হলেও এক ধরনের ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি হয়। কেবল শেষ স্বরধ্বনির মিলকে স্বরমিত্রতা বলা যেতে পারে। যেমন—

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর। (যেতে নাহি দিব)

এখানে 'হর' এবং 'খর' এর মধ্যে শেষের ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে মিল হলেও পূর্বের ব্যঞ্জনে মিল রক্ষিত হয়নি। তাই একে আংশিক মিল বলা যায়। এমন মিলের বিষয়টি স্বরধ্বনির মতো ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একে ব্যঞ্জনমিত্রতা বলে।

৬. মিত্রধ্বনির নৈকট্যের ফলে সৃষ্ট মিল

বাংলা কবিতায় পরপর দুটি পঙ্‌ক্তি বা চরণের মধ্যে মিলের জন্য একই ধ্বনির ব্যবহার হবে বিষয়টি এমন নয়। বরং বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনার বর্গ বা বর্গীয় ধ্বনির ধারণাটি এখানে অনেক কবিতায় মিলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার প্রমাণ মেলে। অর্থাৎ মিলকরণের ক্ষেত্রে একই ধ্বনি না হয়ে যদি কাছাকাছি ধ্বনি হয় তবে নৈকট্য বিচারে সেসব ধ্বনিকে আমরা মিত্রধ্বনি নাম দিতে পারি। সাধারণত বাংলা কবিতায় বর্গীয় ধ্বনিগুলোর মিত্রতাকে কাজে লাগানো হয়েছে। শুধু যে ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে মিলকরণে মিত্রধ্বনির প্রয়োগ হয় এমনটি নয় বরং স্বরধ্বনির ক্ষেত্রেও এমন মিল লক্ষ করা যায়। নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় স্বরধ্বনির নৈকট্য ও ব্যঞ্জনধ্বনির নৈকট্যের কারণে যে মিল সম্ভব হয়েছে তা উদাহরণসহ দেখানো হলো:

সারণি ১ : স্বরধ্বনির নৈকট্যের ফলে সৃষ্ট মিল

স্বরধ্বনির নৈকট্য	কবিতার নাম	উদাহরণ ও ব্যাখ্যা
অ-ও	সোনার তরী	যত চাও তত লও তরণী- **পরে**। আর আছে?– আর নাই, দিয়েছি **ভরে**। এখানে 'পরে' শব্দটির উচ্চারণ 'পরে' অর্থাৎ 'অ' আর 'ভরে' উচ্চারণে 'ও' দিয়ে। অর্থাৎ নৈকট্য থাকায় মিল হয়েছে।
এ-অ্যা	সুরদাসের প্রার্থনা ৬	এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ দূর সরযূর **রেখা** নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে চিরদিন যাবে **দেখা** আলোচ্য কবিতাংশে 'রেখা' শব্দটির সাথে 'দেখা শব্দের মিল হয়েছে। এখানে রেখা– এ ধ্বনির সংবৃতরূপ উচ্চারণ হলেও দেখা শব্দটির ক্ষেত্রে অ্যা (বিবৃত) উচ্চারণ লক্ষ করা যায়।

সারণি ২ : ব্যঞ্জনধ্বনির নৈকট্যের ফলে সৃষ্ট মিল

ব্যঞ্জনধ্বনির নৈকট্য	কবিতার নাম	উদাহরণ ও ব্যাখ্যা
ক-খ	শুধু সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা	হে হংস-বলাকা, ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'ক' এবং 'খ' এর মিল হয়েছে।
গ-ঘ	শুধু সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা	শুধু পলকের তরে পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ।

		পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ; এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'গ' এবং 'ঘ' এর মিল হয়েছে।
চ-ছ	গীতাঞ্জলি	আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে স্থান দিয়ো হে আমার তুমি সবার নীচে। এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'চ' এবং 'ছ' এর মিল হয়েছে।
জ-ঝ	প্রতীক্ষা	সেথা শব্দহীন তীরে ঊর্মিগুলি তালে তালে মহামন্দ্রে বাজে, সেই ধ্বনি কী করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর ক্ষুদ্র বক্ষোমাঝে। এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'জ' এবং 'ঝ' এর মিল হয়েছে।
ট-ঠ	বৈষ্ণব কবিতা	আমাদের ধরা- মধুময় হয়ে উঠে আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে, এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'ট' এবং 'ঠ' এর মিল হয়েছে।
ত-থ	এইক্ষণে	তাই আজি দক্ষিণ পবনে ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা, বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা। এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'ত' এবং 'থ' এর মিল হয়েছে।
দ-ধ	বিজ্ঞ	ধোবা এলে পড়াই যখন আমি টেনে নিয়ে তাদের বাচ্চা গাধা আমি বলি 'আমি গুরুমশাই', ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে 'দাদা'। এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'দ' এবং 'ধ' এর মিল হয়েছে।
ব-ভ	গীতাঞ্জলি	ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু, তাদের পানে তাকাই না যে তবু। এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'ব' এবং 'ভ' এর মিল হয়েছে।
ড়-র	বসুন্ধরা	কত বার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে এখানে নৈকট্য থাকার কারণে 'ড়' এবং 'র' এর মিল হয়েছে।

এছাড়া অনেক সময় যুক্তব্যঞ্জন, যুগ্মব্যঞ্জন, ফলা বা রেফের ব্যবহারের কারণেও কবিতায় মিলকরণের চেষ্টা দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়। যেমন– নিত্য-ভৃত্ত, কীর্তি-পৃথ্বী ইত্যাদি। কবি ন্দ্র-ন্ধ্র-ন্ধ, ন্ন-হ্ন-ন্ন-র্ন, ঙ্গ-ংঘ, স্থ-স্ত, ন্ত-ন্থ, দ্য-ধ্য-দ্ম-দ্দ-দ্ধ, ঃ-খ্য-র্খ,ক্ষ্ম ইত্যাদি ব্যবহার করেও মিলকরণ করেছেন। এছাড়াও আমরা যুক্তস্বর বা সন্ধিস্বরের সাথে অর্ধস্বর দিয়ে মিলকরণের নজির রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও পাই।

৭. উপসংহার

কাব্যভাষা উন্নত, প্রবুদ্ধ ও বিকশিত চৈত্যনের ভাষা যেখানে মিল ধ্বনিসঙ্গতি রক্ষায় প্রকৌশলগত ভূমিকা পালন করে (আবদুল মান্নান, ২০০১ : ৮৭) বাংলা কবিতার হাজার বছরের ইতিহাসে মিলের ব্যবহার শুরু থেকেই ছিল। কাব্যভাষায় মিলের ব্যবহার বহুমাত্রিকতা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় সমাজ, সভ্যতা, জীবনবোধের পাশাপাশি ব্যাকরণিক যে বিষয়গুলোকে নিয়ে চমৎকার ভাষাশৈলী প্রদর্শন করেছেন তার মধ্যে মিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মিলের এই বহুমাত্রিক ব্যবহার পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রধারা অনুসারী কবিদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে বাংলা ভাষায় রচিত কবিতায় মিলের ধারণাটি একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আধুনিক যুগে বিশেষ করে ত্রিশের দশকের কবিতায় মিলের ব্যবহার কমে আসলেও এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। সে কারণে কবিতার ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য কবিরা স্বাধীনভাবেই এখনো মিলের ব্যবহার করে থাকেন, তবে সেখানে পূর্বসূরিদের প্রভাব থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মিলের ব্যবহারে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন সে কথা বলা যাবে না। তবে ব্যাকরণিক নিয়মরে বাইরে মিলের নানামাত্রিক ব্যবহার তিনি করেছেন যা— তাঁর নিজস্ব ভাষাশৈলী হিসেবে বাংলা কাব্যভাষাকে উন্নত ও বিকশিত চৈত্যনের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সহায়কপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০১)। *ছন্দ*। অবসর, ঢাকা।
এবাদত হোসেন (১৯৯১)। *চর্যা পরিচিতি*। রাবি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা, রাজশাহী।
এস এম আবদুল লতিফ (২০০১)। *ছন্দ-পরিচিতি*। অনন্যা, ঢাকা।
জীনাত ইমতিয়াজ আলী (২০০৮)। *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
জীবনানন্দ দাশ (২০১৭)। *জীবনানন্দ-রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা।
তারাপদ ভট্টাচার্য (১৯৭১)। *ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দবিবর্তন*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
পবিত্র সরকার (২০১১)। *গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
——(২০০৭)। *ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দরূপ*। চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা।
——(১৯৯৪)। *পকেট বাংলা ব্যাকরণ*। আজকাল প্রকাশনী, কলকাতা।
প্রবোধচন্দ্র সেন (১৯৫৪)। *ছন্দ জিজ্ঞাসা*। জিজ্ঞাসা প্রকাশন, কলকাতা।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৯৪)। *বাংলা কবিতার ছন্দ*। প্রতীতি প্রকাশন, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১০)। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। প্রথম-সপ্তদশ খণ্ড। বিশ্বভারতী, কলকাতা।